বাংলা ক্ল্যাসিক উপন্যাসে জনপ্রিয় শাশ্বত জুটি

লিখেছেন **মারুফ রায়হান**

বাংলা ক্ল্যাসিক উপন্যাসে এমন অনেক শাশ্বত জুটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাদের প্রভাব কোনো না কোনোভাবে পড়ে প্রেমিক-প্রেমিকাদের ওপর। বলছি না যে, প্রেম করার সময় উপন্যাসের জুটির সংলাপ হুবহু উদ্ধৃত করেন তারা নিজনিজ মনোভাব ও অনুভূতি বোঝাতে। সে তো তারা করেনই; লেখকরা তাহলে আছেন কেন; যদিও সবচাইতে ভালো প্রেম-বাণীর যোগান পাওয়া যায় কবিদের কাছ থেকেই। কারো পছন্দ রবীন্দ্রনাথ, কারো জীবনানন্দ; অনেকেই আবার পুরনো দিনের কবিদের কাছ থেকে শরণ নিতে চান না; খোঁজেন সমকালের কবিদের পঙক্তি। সে যাক, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের যে-যে পরিস্থিতির ভেতর ফেলে দেন ঔপন্যাসিক; বাস্তব জীবনে অনেক সময় সে রকম ক্রাইসিসের ভেতর পড়ে যান প্রেমিক/প্রেমিকারা। আসলে প্রেম এমন একটি অথৈ সাগর– যার গভীরে নিমজ্জনের অভিজ্ঞতা বিবিধ-বিচিত্র হলেও মূল অনুভূতিগুলো প্রায় একই রকম। প্রেমে পড়লে যেমন অনেকের মরে যেতে ইচ্ছে করে, তেমনি প্রেম না পেলেও গলায় দড়ি দেয়া অনিবার্য বলে মনে হয়।

একটির শীতলতার মাত্রার সঙ্গে অন্যটির তাপমাত্রা এক পাল্লায় মাপা চলে না। আমাদের কথাশিল্পীদের কেউ কেউ চিরকালের জন্যে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এমন কিছু যুগলকে, যাদের ছবি আমাদের মনের গভীরে চিরভাস্বর। যেরকম 'শেষের কবিতা'-র অমিত-লাবণ্য। যে রকম শরৎবাবুর 'দেবদাস'-এর পার ও দেব, মানে পার্বতী ও দেবদাস। অমিত-লাবণ্য কিংবা দেবদাস-পার্বতীর প্রেম পায়নি প্রথাগত পরিণতি; বিয়ে হয়নি তাদের। তবে বিয়ের জন্যে তৎপরতা ছিল। পার্বতীর মন প্রথম বিয়ের প্রয়োজন বুঝেছে; আর দেবদাস অনেক পরে। এমনকি পার্বতীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও দেবদাসের সেই আকাঙ্ক্ষা চিতায় চড়েনি। বিবাহিত পার্বতীর হৃদস্পন্দন রুদ্ধ করে দেয়ার মতো প্রশ্ন সে ছুঁড়ে দিয়েছে; বলেছে, 'তুমি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পার?'

অমিত-লাবণ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি কীরকম? দু'জন দু'জনকে ভালোবেসেছে গভীরভাবে। অমিতের চারিত্র্য এবং স্বভাব সে বুঝেছিল বলেই তার বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়িতেও প্রথমে সম্মতি দেয়নি লাবণ্য। কিন্তু এক পর্যায়ে

অমিতের স্ত্রী হওয়ার জন্যে মনকে সে রাজি করালো। অমিত কী করলো? সে ফিরে পেলো তার পুরনো কেয়াকে (কেতকী); বিয়ের তোড়জোড় হলো শুরু; বন্যাকে তো সে চিরকালের জন্যেই অর্জন করেছে। এখন তার প্রতিদিনের ব্যবহার্য জল দরকার, ঘড়ায় তোলা জল। অমিতের কাছে লাবণ্য হয়ে উঠলো দিঘি, যে-দিঘি ঘরে আনবার নয়; তার মন তাতে সাঁতার দেবে।

২. প্রথমেই প্রেমের সংলাপ নয়, উদ্ধৃত করছি অ-প্রেমের উক্তি। ক. তোমাকে যে আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনোদিন মনে হয় নাই; আজও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না। শুধু এই আমার বড় দুঃখ যে, তুমি আমার জন্যে কষ্ট পাইবে।– দেবদাস খ. আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই তাঁরা তোমার মত একজন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দান্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতেই তুলে দেবেন না।– পার্বতী দেবদাসের ওই উক্তি থেকে স্পষ্ট যে বাল্যকালে খেলার সাথী পারস্পরকে প্রথমে ভালোবাসেনি সে, যদিও সে-কথা সরাসরি জানিয়ে দিতে তার এতটুকু দ্বিধা নেই। তবু দেবদাস দুঃখ প্রকাশ করেছে মেয়েটির কষ্টের কথা জেনে। কিন্তু অচিরেই উপন্যাসটির পাঠক জেনে যাবেন যে কে কার জন্যে কষ্ট পায়। দেবদাসের কষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তাকে তরল পদার্থের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় সম্পূর্ণভাবে; শুধু তাই নয়, চন্দ্রমুখী নামের এক বারনারীর সেবা পাওয়ার জন্যেও পেরেশান হতে হয়। চন্দ্রমুখীও ভালোবেসেছে দেবদাসকে গভীরভাবে। বরং পার্বতীর পক্ষে যেটা দেবার সুযোগ হয়নি, চন্দ্রমুখী সেই সেবাযত্ন দিয়েছে; দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছে দেবদাসকে। প্রেমের স্বার্থ (তোমাকে ভালোবেসেছি, তাই চাই তোমারও ভালোবাসা– এমন মনোভাবকেই বলছি প্রেমস্বার্থ) ছিল না তার, সে-বিবেচনায় পার্বতীর চাইতে সে কোনো অংশে ছোট নয়। তবু উপন্যাসে সে পার্শ্বচরিত্র, সমালোচকরাও প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি চন্দ্রমুখীকে।

নারী-পুরুষ একই বৃক্ষের দু'টি ডাল নয়, সেটা এই দুই নর-নারীর মনোভুবন থেকেও দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব। নারী, মানে সেকালের নারী বাল্যসখাকে (অর্থাৎ, পারু দেবদাসকে) জীবনসখা করার স্বপ্ন লালন করেছে। পুরুষ এ ব্যাপারে বরাবরই নির্লিপ্ত। আমাদের পার্বতীর কী দশা? সে চায় তার কিশোরবন্ধন চিরজীবী হোক, আর তার একমাত্র পন্থা হলো বিয়ে করা। বিয়ে ছাড়া দুই বাল্যসখা কীভাবে অবিচ্ছিন্ন থাকবে? যখন পার্বতী সমাজের রীতিনীতি বুঝে গেল, জেনে গেল তাদের বিয়ে হবে না, তখন কি সে হাল ছেড়ে দিয়েছিল! প্রেমিকমাত্র জানেন, প্রেম কখনো হাল ছাড়ে না। সে সাহসী হয়, ঝেড়ে ফেলে চক্ষুলজ্জা। তবে সেকালের নারী প্রেমাস্পদের পায়ের ওপর মাথা রেখে চোখের জল ফেলেছে। শরৎবাবু যদি নারী হতেন তাহলে সম্ভবত তার নায়িকা এতখানি কাঙালপনা দেখাতো না। বাক্যটি লেখার পর আমার মনে হচ্ছে, আমাদের ভালোবাসার উপন্যাসগুলোয় পুরুষকে আমরা যতখানি নির্দয়, পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারী এবং নারীকে যেমন আত্মসম্মান বিসর্জনকারী হিসেবে দেখি– নারী ঔপন্যাসিকরা লিখলে প্রেমকাহিনী বদলে যেতো। হয়তো ওই নারী লেখকের কাছে উপন্যাসের নাম 'দেবদাস'-এর চাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হতো 'পার্বতী' নামটি। যাই হোক, বলছিলাম পার্বতীর ভেসে যাওয়ার কথা, সমাজে কলঙ্কিনী হওয়ার আশঙ্কাকে তুচ্ছজ্ঞান করে রাতে দেবদাসের কাছে ছুটে আসার কথা। বাংলাদেশে সিনেমার পার্বতী হয়েছিলেন মিষ্টি মেয়ে কবরী। তিনি এখনও ভোলেননি পার্বতীর ওই সংলাপ– ' দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না।' আমার নিজ কানেই শোনা।

আচ্ছা, ভালোবাসায় আবার কিসের কলঙ্ক? নারী এই কলঙ্ককে পাত্তা দেয় না। অথচ পুরুষ কলঙ্কতিলক এঁকে দেয়ার জন্যে কত উদগ্রীব। দেবদাস জানে যে, সে যাকে ফিরিয়ে দিয়েছে সেই পার্বতীর আজ বাদে কাল বিয়ে। তবু কর্তৃত্ব আরোপের চেষ্টা তার। বিফল হয়ে আঘাত করে পার্বতীকে; ফাটিয়ে দেয় মাথা।

এই না হলে 'পুরুষ'! অথচ ওই আঘাত সম্বন্ধে পরবর্তীকালে পার্বতীর মূল্যায়ন এরকম : 'দেবদা ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, এ আমার সম্বল। তুমি আমাকে ভালবাসতে– তাই দয়া করে আমাদের বাল্য ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েছ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী।' ভাবলে অবাকই লাগে, আজও বাঙালি নারীরা দেবদাসের জন্যে চোখের জল ফেলে। তার জন্যে মেয়েদের দরদ উথলে ওঠে। ভাবখানা এমন : আহা পারুর জন্যে কী উচ্ছন্নেই না গেল ছেলেটা! কী ভালোবাসা, শেষমেশ জীবনটাই ছুঁড়ে মারলো নগণ্য বস্তুর মতো। তা-ও কিনা স্ত্রী হিসেবে না-পাওয়া প্রেয়সীর শ্বশুর বাড়ির আঙিনায়। অবাক হই দেখে যে, দেবদাসের জন্যে, তার দেখানেপনা কষ্টের জন্যে আজকের আধুনিক নারীরও বুক ভেঙে যায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেবদাসের কোনো ছোট ভাইকেও সে সহ্য করে না। অমন দিওয়ানাপনা মেয়েদের ভারি না-পছন্দ। আজকের বাঙালি নারীর প্রেম বদলে গেছে ঢের। উপন্যাসের নায়কের দুর্দশা দেখে সে চোখের জল ফেলবে, কিন্তু বাস্তবের মজনুর জন্যে তার হৃদয়ে কোনো স্পেস নেই।

বলছিলাম, একজন পুরুষ লেখকের হাতে দেবদাস রচিত হওয়ার কথা। দেবদাস পার্বতীর সঙ্গে যে-আচরণ করেছে, শুরুর দিকে তার ভালোবাসাকে যেভাবে উপেক্ষা করেছে তাতে দেবদাসের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি থাকার কথা ছিল না একবিংশ শতকের নারীর। সেকালের নারীরও কি থাকার কথা? শরৎবাবু বিচক্ষণ লেখক, তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তো ইনিয়ে বিনিয়ে তার সহানুভূতি সংগ্রহের করুণ প্রচেষ্টা। উপন্যাসের শেষ ক'টা লাইন আরেকবার পড়ুন। কী আছে সেখানে? "এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে, জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্যে একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময় যেন একটি স্নেহ-কর স্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে। যেন একটি করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।"

৩. রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' একটি বহুলপঠিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস। ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে প্রেমিক মনের কাছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম দেখায় প্রেম– এরকম একটা আপ্তবাক্য আছে বাংলায়। বাঙালির অনেক প্রেমই প্রথম দেখায় হয়ে যায়, হোক না তা একতরফা। উপন্যাসেও আমরা বারবার দেখি যে, প্রথম দেখায় প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন নায়ক বা নায়িকা। আসলে এটাকে প্রেম না বলে আকর্ষণ বলাই সঙ্গত। এরপর সেই আকর্ষণ মোহের রূপ নেয়, তখন তাতে মোহর-অর্জনের চাহিদা তৈরি হতে থাকে। এভাবেই তো ধীরে ধীরে ভালোবাসা বাড়তে থাকে। আবেগ মেলতে থাকে ডাল-পালা, বলা ভালো, পালাক্রমে তাতে যোগ হয় ডানা; কী দশা তখন একজন প্রেমপিয়াসী ব্যক্তির, পা কখনো মাটিতে, কখনো বা ভারসাম্য এলোমেলো করে দেয়া শূন্যে, হাওয়ায়। করোটিতে ব্রহ্মাণ্ডের বহু বর্ণিল স্পন্দন।

কথা হচ্ছে, প্রেমের পেছনে কি প্রথম সাক্ষাতের স্থান এবং কাল কোনো অমূল্য ভূমিকা রাখে? হ্যাঁ, বা না– দুটোই হতে পারে। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথে দেখি, আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে পারি, 'কবিতা' শব্দযুক্ত নামের তাঁর উপন্যাস ' শেষের কবিতা'য় দেখি নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ হচ্ছে এমন একটি স্থানে যাকে নিসর্গের স্বর্গভূমি বললে অত্যুক্তি মনে হবে না। আঁকাবাঁকা সরন্ন রাস্তা, জঙ্গলে-ঢাকা খাদ, মাথার ওপরে বিশাল বিস্মৃত আকাশ– শিলং পাহাড়ের মনোমুগ্ধকর পটভূমিতে অমিত আর লাবণ্যের প্রথম পরিচয়। তাও আবার নাটকীয়ভাবে।

অমিত-লাবণ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি কীরকম? দু'জন দু'জনকে ভালোবেসেছে গভীরভাবে। অমিতের চারিত্র্য এবং স্বভাব সে বুঝেছিল বলেই তার বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়িতেও প্রথমে সম্মতি দেয়নি লাবণ্য। কিন্তু এক পর্যায়ে অমিতের স্ত্রী হওয়ার জন্যে মনকে সে রাজি করালো...

প্রেমের ক্লাসিক উপন্যাসে নায়িকার চমৎকার বর্ণনা একটি অনিবার্য বিষয়। এই উপন্যাসে তো লাবণ্য একক নায়িকা নয়, আছেন দ্বিতীয়জন, অমিতের জীবনে যিনি প্রথমজনই। সেই কেতকীর বর্ণনাটিও আকর্ষণীয়। প্রথমে অমিতের সঙ্গে প্রথম দর্শন-মুহূর্তের লাবণ্যকে কিভাবে এঁকেছেন কবি সে-প্রসঙ্গ। লিখছেন : মেয়েটির পরনে সরন্ন-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ব ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দু হাতে দুটি সরন্ন পেন্সন বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি-কাজ করা রন্নপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

আর কেতকী সম্পর্কে বলা হয়েছে : সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশ গৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উলম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি-বা দেখে তো লক্ষই করে না, যদি-বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম বয়সে ঠোঁট দুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বারবার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি, তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহু দুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর, যখন সুমার্জিতন খররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলঙ্করণের অঙ্গ-রূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশে নয়।...

পাঠক, দুই নারীর চিত্র অঙ্কনের ভেতর কোনো পক্ষপাতিত্বের সৌরভ কি পাওয়া যায়? যাই হোক, কবিগুরুর এই নায়ক অমিত রায় একজন নাম-গোপনকারী কবি। প্রেমিকা লাবণ্যকে সে শোনায় জনৈক নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা, যদিও বুদ্ধিমতী লাবণ্য একেবারে গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে এই নিবারণ আর কেউ নয়, স্বয়ং অমিত, মানে তার মিতা। মিতাটির সঙ্গে কবিগুরুর কবিতার মিতালী রয়েছে, যদিও সে চায় রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে গিয়ে কবি পরিচিতি পেতে। লাবণ্য নিজেও কি কবি নয়! তার কবিতা দিয়েই যবনিকা ঘটেছে এই উপন্যাসের। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে উপন্যাসটির আরেক উপেক্ষিত নায়ক শোভনলাল প্রসঙ্গে সামান্য নিবেদন। শেষ পর্যন্ত শোভনলালের সঙ্গেই

প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই

লাবণ্যের বিয়ে পাকাপাকি হয়। তবে এক পর্যায়ে তার অবস্থান কেমন ছিল লাবণ্যের কাছে সেটা বোঝাতে দু'টি বাক্য তুলে দিচ্ছি। প্রেমজীবনের একটি গভীর সত্য হিসেবেও কথাগুলো বিবেচিত হতে পারে। কথাগুলো হলো : "যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উল্টো পিঠে।"

'শেষের কবিতা'-তেও পুরুষতন্ত্রের আছর আছে। অমিতের মনে হয়, লাবণ্যকে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন। এই ভাগটা কী সেটা বোঝা যায় খানিক পরেই। তা হলো 'মননের শক্তি'। লাবণ্য কেন প্রথমে অমিতকে বিয়ের বন্ধনে জড়াতে চায়নি সেটা একটা বিগ কোশ্চেন, যেখানে প্রায় সমস্ত প্রেমেরই লক্ষ্য থাকে বাসর-রাত রচনার। প্রেমে মহত্ব একটি বিরল বিষয়। এই বিরল জিনিসটি সাহিত্যেও কম এসেছে। শেষের কবিতা যে-সব কারণে বাংলা উপন্যাসে অমরত্ব পেয়ে গেছে তার একটি প্রধান উপাদান লাবণ্যের ওই মহত্ব। পক্ষান্তরে আছে অমিতের আত্মকেন্দ্রিকতা, যাকে বরং স্বার্থপরতা বলাই সমীচীন হবে। লাবণ্য বিয়ে করে অমিতকে কষ্ট দিতে চায়নি। সে ভেবেছিল, 'বিয়ে সকলের নয়। খুঁতখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রী-পুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে, মাঝে ফাঁক থাকে না; তখন একবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে।' লাবণ্য ঠিকই বুঝেছিল যে অমিত ওকে ঠিক ঘরের মেয়ে হিসেবে দেখেনি। সে অমিতের মন স্পর্শ করেছিল বলেই অমিতের মন অবিরাম অজস্রভাবে বাঙময় হয়ে উঠেছে; ওই বাঙময়তার ভেতর দিয়েই অমিত গড়ে তুলেছে লাবণ্যকে। অমিতের মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।

বাংলা উপন্যাসে তাই মহত্তম প্রেমিকার নাম লাবণ্য। এই মহত্বে কিছুটা সনাতন নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হওয়ায় (হাজার বছরের মানসিক ধারাবাহিকতার কারণেই এমন হয়েছে, যেমন পুরুষের গ্রোত্রে হয় খুব সচেতন ও বড় মনের না হলে) তার মহত্ব এতটুকু কমেনি। তবে সামান্য পাঠক হিসেবে আমার খারাপ লেগেছে। লাবণ্য কেন বললো যে,

হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

এত বিনয়ের এত সমর্পণের প্রয়োজনটা কী? তোমাকে আমি যা দিয়েছি সেটা তোমারই দান! যে-পুরুষের জন্যে এই নিবেদন সে তো লাবণ্যকে বিয়ের আংটি পরানোর পরও নিজের ছোট্ট বাসা পেয়ে ডানা গুটিয়ে বসেছে। ছোট্ট বাসাটি মানে যে কেতকী– পাঠককে সে না বললেও চলে।

ক্ল্যাসিক বাংলা উপন্যাসে অনেক শাশ্বত জুটির সন্ধান পাবেন সাহিত্যপ্রেমীরা। তবে তাদের স্রষ্টা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এখনও ঈর্ষণীয়ভাবে জনপ্রিয়।

বইমেলার
নতুন বই
আনিসুল হকের

উপন্যাস
- দুঃস্বপ্নের যাত্রী (সময়)
- নন্দিনী (কাকলী)
- তিনি এবং একটি মেয়ে (পার্ল)

কিশোর উপন্যাস
- বোকা গোয়েন্দা (অনন্যা)

সংকলন
- রম্য অরম্য (পার্ল),
- গদ্যকার্টুনসমগ্র-২ (পার্ল)
- হাসির চার উপন্যাস (সময়)